রোগনির্ণয় ও চিকিৎসায় বিমূর্তের ভূমিকা

শুভানন রায়

রোগীর চিকিৎসা বস্তুত বিমূর্ত এবং অ-বিমূর্ত, দুই পদ্ধতির মিশ্রণ।

'ডায়াগনোসিস' বা রোগনির্ণয় প্রথমত রোগীর 'সিম্‌টম'-এর উপর নির্ভর করে। রোগী বলে যে আমার খুব পেট ব্যথা করছে বা খুব সর্দি লেগেছে। এইভাবে রোগী তার অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলে যেতে থাকে।

তারপর আমরা তাকে শারীরিকভাবে পরীক্ষা করি, 'ডায়াগনোসিস'-এ একটা অংশ যেমন শারীরিক অসুস্থতা কতটুকু সেটা দেখা, তেমনই রোগীর মানসিক কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটাও চিকিৎসকের বিচার্য। রোগীর মানসিক গঠন এবং ব্যক্তিগত জীবনের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা সহজ নয়। যেমন, একজন 'হাইপারটেনশন'-এর রোগীর কথা ধরা যাক। হয়তো চরিত্রের দিক থেকে সে একজন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি। আমি যদি তাকে ক্রমাগত ওষুধই দিয়ে যাই তবে তার মানসিক চাপ কমবে না। কিছুদিন পর ওষুধেও কাজ হবে না। তার প্রয়োজন জীবনকে সহজভাবে নেবার শিক্ষা।

শারীরিক ও মানসিক দুটো অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে আমাকে তার চিকিৎসা করতে হবে।

'ডায়াগনোসিস'-এ বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলার সূত্র খোঁজা হয়।

রোগী যখন নিজেকে দেখাতে আসে বা তার আত্মীয়স্বজনরা যখন তাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে আসে তখন আমরা রোগীর মুখে বা যারা তাকে এনেছে তাদের মুখে একধরনের বর্ণনা পাই— অসুখের, আঘাতের বা যন্ত্রণার।

প্রথম পর্যায়ে সমস্তটাই বিশৃঙ্খল। আমরা ধরে নিই যে রোগী এবং তার আত্মীয়স্বজনরা গুছিয়ে, চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, কার্যকরভাবে পেশ করতে পারবে না। এটাই স্বাভাবিক। সমস্তটাই শুরুতে তালগোল-পাকানো, অস্বচ্ছ এবং পরম্পরাহীন হয়ে থাকে।

অতঃপর আমাদের কাজ হল ঐ এলোমেলো কথাবার্তার মধ্যে একটা শৃঙ্খলার সূত্রকে খোঁজা।

এখানে একটা সমস্যা আছে।

প্রথমত, শৃঙ্খলার নামে রোগীকে একটা আবদ্ধ অবস্থার মধ্যে এনে ফেললে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা বাড়তে পারে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হয়তো রোগী (ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়) গোপন করছে। তার ফলে একটা ধাঁচ বা স্ট্রাকচার তৈরি করায় ত্রুটি ঘটতে পারে।

দ্বিতীয়ত, চিকিৎসকও নিরপেক্ষ নন। তাঁর অধীত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার মধ্যে আলোচ্য রোগীর অসুস্থতার একটি উদাহরণ এবং পূর্বনির্ধারিত কার্যকারণ সম্পর্ক তিনি খুঁজবেন। তারপর, মেলানোর দায়। এই 'ম্যাচিং' করানো একটি মৌলিক কাজ। এইখানে বিমূর্ত চিন্তার একটি মুখ্য এবং সক্রিয় ভূমিকা আছে। অর্থাৎ আমরা ক্রমে অ্যাবস্ট্রাকশনের দিকে যেতে থাকি।

মানুষ তো কার্যক্ষেত্রে, সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে, সর্বত্র এই-ই করে থাকে। বহু বিশৃঙ্খল সংবাদ, তথ্য, ঘটনা, ছবির মধ্যে থেকে একটা সূত্র, একটি নিয়ম, এক পরম্পরা খোঁজাই তো ফলিত বিজ্ঞানের কাজ। ইংরেজিতে যাকে বলা চলে— 'এ সার্চ ফর এ প্যাটার্ন'।

তারপর শুরু হয় শারীরিক পরীক্ষা। তার নানা পথ নির্ধারিত আছে। রোগীর পুরনো ইতিহাস পর্যালোচনা করারও প্রয়োজন থাকে। আজকাল 'প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট' অর্থাৎ রক্ত-মল-মূত্র পরীক্ষা না করে চিকিৎসকরা জটিলতর অসুখের চিকিৎসার দিকে যেতে চাইবেন না। রক্তচাপের রোগীর জন্য চাই 'ই. সি. জি রিপোর্ট' বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চাই 'এক্স-রে' ছবি।

অতীতে যেমন নাড়ী দেখে অভিজ্ঞ কবিরাজরা অনেক কিছু বলতে পারতেন— আজকাল আর তেমনটি হয় না। যদিও আমাদের প্রত্যেককেই নাড়ী দেখায় অভ্যস্ত হতে হয়। কিন্তু শুধু ওটুকুই যথেষ্ট নয়।

তারপর আসে ওষুধ এবং পথ্যের বিধান। এখানেও আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র বহুদূর

প্রসারিত। এক-একটা ওষুধই এক-একটা পরিবার।
যেমন ধরা যাক পেনিসিলিন। বহু রকমের পেনিসিলিন আছে। কোন্ রোগে কোন্‌টি কার্যকর হবে এটা চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতা এবং পঠনপাঠন থেকে জেনেছেন। প্রতিটি ওষুধেরই কিছু-না-কিছু অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়া থাকে। সেগুলিরও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।
কী পরিমাণ ওষুধ ব্যবহৃত হবে— সেটাও বিবেচ্য। তারপর শল্যচিকিৎসার কথা আসে।
অর্থাৎ আমরা ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও বিধানের দিকে যেতে থাকি।
এই ভাবে, প্রথমে যে তালগোল-পাকানো একটা সমস্যার কথা বলেছিলাম, অর্থাৎ রোগী প্রথম দর্শনে চিকিৎসকের কাছে যে-চিত্রটি মেলে ধরে— তার জট ক্রমে খুলতে থাকে। এর মধ্যে অবশ্যই ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
বিমূর্ত এবং অ-বিমূর্তের মধ্যে যাতায়াতে অসতর্ক এবং অনভিজ্ঞ পা ফেলার সম্ভাবনাকে কেউ অস্বীকার করবে না।
কিন্তু আমরা যে-শাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করি, অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্র, তার সাধারণভাবে বলা যায় দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে।
প্রথমত, এটি 'এমপিরিক্যাল' বা পরীক্ষামূলক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান নির্ভর। সহজ-ভাবে বলা যায়, চোখে-দেখা, কানে-শোনার এখানে প্রধান ভূমিকা।
দ্বিতীয়ত, রোগনির্ণয়ের পদ্ধতিটি হল 'ডিডাকটিভ' অর্থাৎ অবরোহী। ব্যাখ্যা করে বলা চলে যে, বহু কিছু চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ দেখার পর চিকিৎসক একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যার সঙ্গে জড়িত থাকে অধীত জ্ঞান ও পূর্ব অভিজ্ঞতা।
বলা বাহুল্য প্রতিটি চিকিৎসক কাজের প্রতিটি স্তরে তাঁর নিজস্ব মানসিক প্রক্রিয়া ও তার ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন নাও থাকতে পারেন। কিন্তু এই নক্সা বা 'স্ট্রাকচার'টি না জানলে কোনো চিকিৎসকের শাস্ত্রাধিকার হয় না। অর্থাৎ, তাঁর রোগনির্ণয়, চিকিৎসা বা ওষুধপথ্যের বিধান দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। □